জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

UNIC Dhaka

PEACE
2001-2010 INTERNATIONAL DECADE FOR A CULTURE OF PEACE AND NON-VIOLENCE FOR THE CHILDREN OF THE WORLD
IS IN OUR HANDS

জুন ২০০৭

June 2007

১৯শ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

Volume-IXX, No. VI

শান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টার চেয়ে শান্তিরক্ষায় আমরা বেশি অগ্রসর

মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন, 'শান্তিরক্ষা ক্রম বিস্তৃত চাহিদার চাপ সহ্য করছে'

আজকের শান্তিরক্ষা এক নজিরবিহীন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আমাদের হিসাব মতে, বিশ্বে বর্তমানে ১৮টি মিশনে সামরিক, পুলিশ, বেসামরিক মিলিয়ে এক লাখের মতো সদস্য নিয়োজিত রয়েছে। এই প্রসারকে দু'ভাবে দেখা যায় : কেউ বলতে পারেন যে, এটা হলো এই শুভ লক্ষণ যে, কয়েকটি সংঘাত বন্ধ হতে চলেছে; তবে ১৮টি মিশনকে সফল করার জন্য সম্পদ, সৈনিক ও রাজনৈতিক নিয়োজনের যোগান দেয়া কেবল সচিবালয় নয় বরং সদস্য দেশগুলোর জন্যও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০৭ সালে ডিপিকেওর প্রধান প্রধান অগ্রাধিকার কি?

আমাদের অগ্রাধিকারগুলো হলো বৃহত্তর সংহতি এবং আমাদের শান্তি কার্যক্রমের প্রতি অধিকতর কার্যকর সমর্থনের লক্ষ্যে সংস্কার প্রক্রিয়া জোরদার করা; কারণ জাতিসংঘের তুলনামূলক সুবিধা হলো সামরিক, পুলিশ ও বিশ্বজোড়া সমর্থনের সমন্বয়। যেখানে বিরাট একটা কিছু বিপন্ন সেখানে সুনির্দিষ্ট মিশনের অগ্রাধিকারও আমাদের রয়েছে। গণতান্ত্রিক কঙ্গো

প্রজাতন্ত্রে (ডিআরসি) কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো নির্বাচন হওয়ায় এবং যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটিতে প্রথমবারের মতো আশা দেখা দেয়ায় ২০০৬ সালে আমরা বিরাট সাফল্য অর্জন করি। এই অর্জন আমরা ২০০৭ সালে সংহত করতে চাই, যা কেবল গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রই নয়, বরং সমগ্র আফ্রিকার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ যা আমরা ২০০৭ সালে সাফল্যজনকভাবে মোকাবিলা করতে চাই। দ্বিতীয়টি হলো দারফুরের অব্যাহত ট্র্যাজেডি, যাকে আমরা সেই বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেখছি যা ইতোমধ্যে সুদানে অর্জিত হয়েছে, যেখানে আমরা আফ্রিকার সর্ববৃহৎ সংঘাত : উত্তর-দক্ষিণ সংঘাতের অবসানে সত্যিকার অগ্রগতি অর্জন করেছি। সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে একটা বড় শান্তিরক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। এই কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন এজন্য রয়েছে যে, এ পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতি আপোসমূলক নয়। একটি নতুন পরিস্থিতির অন্বেষায় আমরা আফ্রিকান ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করছি যাতে সংঘাতের অবসানে একটা যৌথ প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে। আরেকটি অগ্রাধিকার হলো কসোভোর পরিস্থিতি, যা সহিংসতায় বিধ্বস্ত হয়েছে এবং স্থিতিশীলতা যেখানে এখনো আসেনি। জাতিসংঘের ব্যাপক নিয়োজন প্রশংস-নীয়, তবে স্পষ্টতই পরিস্থিতির জটিলতা নিরসনের প্রয়োজন রয়েছে। কসোভোর ভবিষ্যৎ মর্যাদা নিয়ে আলোচনা চলছে ফিনল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া কূটনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো জাতিসংঘকে এগিয়ে নেয়া, যা আরেকটি পর্যায়ে যাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করেছে যে পর্যায় হলো সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পুনর্মিলনের একটা প্রত্যাশিত দৃঢ়

ভিত্তি রয়েছে এমন অবস্থা দেখে সেখান থেকে বিদায় নেয়া।

কয়েকটি মিশনের ম্যান্ডেট সহসাই শেষ হবার কথা- এগুলোর মেয়াদ কি বৃদ্ধি করা হবে?

অবশ্য প্রতিটি ম্যান্ডেটই নিরাপত্তা পরিষদ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে। শান্তিরক্ষায় আমরা যারা নিয়োজিত রয়েছি তারা একটা মিশন গুটাতে পারলেই খুশি। কারণ, আমাদের কাছে উত্থাপিত সবগুলো দাবি আমরা খতিয়ে দেখি। আমরা মনে করি যে, ভালো শান্তিরক্ষায় আমাদের যত দ্রুত সম্ভব মোতায়েন করতে হবে- গত গ্রীষ্মে লেবাননে মিশন জোরদার করার কাজটি চমকপ্রদ দ্রুত মোতায়েনের একটি দৃষ্টান্ত। আমরা বুরুন্ডিতে একটি মিশন কেবল শেষ করেছি এবং এক বছর আগে সিয়েরালিয়নেও আমরা অপর একটি মিশন সমাপ্ত করেছি। এ বছর আমাদের পরিস্থিতি এমন যে, আমরা কেবল শান্তি বিনির্মাণ করছি এবং আর কোনো শান্তি রক্ষা মিশন শুরু করছি না। অবশ্য কসোভোর পরিস্থিতি দেখে আমি আশা করছি যে সেখানে একটা মৌলিক বিবর্তন হবে, তবে সেই বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমরা অসময়ে চলে এলে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

দ্রুত প্রতিক্রিয়া-সামর্থ্য বর্ধনে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?

আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। প্রথমে, আমরা ইতালির ব্রিনডিসিতে কৌশলগত মোতায়েনের মজুতসহ একটি ঘাঁটি গড়ে তুলেছি। এখান থেকে আমরা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো সরঞ্জাম তাৎক্ষণিকভাবে পেতে পারি। ফলে আগে যা পেতে কয়েক মাস সময় লেগে যেত তা এখন আমাদের হাতের নাগালে প্রস্তুত। দ্বিতীয় হলো, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামর্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা উলে-খযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি-আমি এখানে পুলিশের কথা ভাবছি। আমরা একটা স্থায়ী পুলিশ সামর্থ্য মোতায়েন করছি, একদল অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারকে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় নিয়োজিত করছি, যেখানে যাওয়ার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন হবে তারা সেখানে যেতে প্রস্তুত থাকবে। তৃতীয়টি হচ্ছে; সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবস্থা জোরদার করা। আমাদের একটা সদা প্রস্তুত ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা না চাইলে এ ব্যবস্থা কাজ করে না। সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে আমরা আরো বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও আরো একটা দৃঢ় অঙ্গীকার চাইছি। আমরা জানি যে, সদস্য দেশগুলো নির্দিষ্ট কোনো মিশনের গুণাগুণের নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; কিন্তু আমরা এমন প্রতিশ্রুতি পেতে চাই যা

হবে পর্যাপ্তভাবে সুনির্দিষ্ট এবং অন্তত কিছু সৈন্যকে নির্দেশ মাত্র মিশনে যাওয়ার প্রস্তুতিতে রাখতে হবে। আর তা যখন থাকে না, তখন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যা কাজ করে বলে পরীক্ষিত হয়েছে তা হলো বহুজাতিক বাহিনীসহ একটি অস্থায়ী শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা, যেমনটি আমরা গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের নির্বাচনের সময় ইউরোপীয় বাহিনীকে নিয়ে করেছিলাম। এটা গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে জাতিসংঘ মিশনকে (মোনাক) শক্তিশালী করেছিল। মোনাকে আমরা আরো কিছু কার্যক্রম যোগ করছিলাম। যার মধ্যে আমরা ইউরোপীয় বহুজাতিক বাহিনীর বাড়তি সহায়তা পেয়েছিলাম, প্রতিবেশী বুরুন্ডি থেকে কিছুটা শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম এবং আমাদের নিজস্ব বাহিনী তো মোতায়েন ছিলই। সামগ্রিকভাবে আরো দ্রুত প্রতিক্রিয়ার সুবিধার্থে আমরা একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা মোতায়েন করেছিলাম।

জাতিসংঘ-ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা কি একটি মাইলফলক হিসেবে অভিনন্দিত?

এমন একটা সামগ্রিক কার্যক্রম রয়েছে যেখানে আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারি। গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে (ডিআরসি) আমরা যা করেছি প্রয়োজনে অন্য কোনো স্থানে আমরা অনুরূপ কিছু করতে পারি। এছাড়া শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে আমি যত বেশি সম্ভব ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেনা পেতে চাই। কেননা এতে সব মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব থাকা অপরিহার্য। দশ বছর পর গত গ্রীষ্মে লেবাননে শান্তি কার্যক্রমে জাতিসংঘের নীল হেলমেট পরিহিত ইউরোপীয় সৈনিকদের প্রত্যাবর্তন দেখতে ভালো লেগেছে। এখন এখানে ইউরোপীয়দের বড় ধরনের উপস্থিতি রয়েছে। এছাড়া ডিআরসি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে এর ভূমিকার কথা কম জানা থাকলেও নিরাপত্তা খাতে সংস্কারের জন্য ইইউর একটা কর্মসূচি রয়েছে যা যথেষ্ট মূল্যবান। ইউরোপীয় কমিশনের মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তার আকারেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বাত্মক কর্মপ্রচেষ্টা চলছে। বিশ্বে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সর্ববৃহৎ দাতা, আর আমরা দেখছি যে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সব পর্যায়ে এটা কতো গুরুত্বপূর্ণ-কর্মসুযোগ সৃষ্টি, অর্থনীতিকে তেজোদ্দীপ্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি বলিষ্ঠ উন্নয়ন কর্মসূচি চালানো এবং তাতে ইউরোপের সংশি-ষ্টতা অনেক গুরুত্ববহ।

শান্তি বিনির্মাণে ডিপিকেওর ভূমিকা কি বিস্তৃত করা যাবে?

আমি মনে করি যে, শান্তি বিনির্মাণের চেয়ে শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘ সামগ্রিকভাবে অনেক এগিয়ে আছে। শান্তি বিনির্মাণ কমিশন এবং শান্তি বিনির্মাণ সহায়ক দপ্তর গঠন বড় ধরনের অগ্রগতি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো-কেবল জাতিসংঘ নয় বরং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বড় ধরনের উন্নয়ন বাজেট সংবলিত দেশগুলোকে জীবন সহায়ক কর্মকা□র মাধ্যমে দেশগুলোর সামর্থ্য গড়ে তুলতে সংঘাত-পরবর্তী সাহায্যদানে আরো বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এমন একটা চ্যালেঞ্জ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি-আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পরিচালিত বিপুল সহায়তা কার্যক্রমে লাখ লাখ লোকের জীবন রক্ষা পেয়েছে। এখন সেখানে চ্যালেঞ্জ হলো সামর্থ্য বিনির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা, যার মাধ্যমে ঐক্য ফলপ্রসু হবে। দক্ষিণ সুদানের জনগণকে সাহায্য করার সত্যিকার সামর্থ্য ছিল সেখানকার সরকারের। সেখানে আপনাদের অনেক কিছু করার আছে।

তিমুর লিসতে-এ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শেষ করার পর পুনঃ প্রত্যাবর্তনে লক্ষণীয় কী আছে?

আসলে আমাদের কিছু বিপদ সঙ্কেত ছিল এবং তিমুর লিসতে-এ শান্তি স্থিতিশীল করার মৌলিক সবকিছু অর্জিত হয়েছে কিনা আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। আমার মতে প্রথম শিক্ষা হলো, ইতোমধ্যেই যেসব বিনিয়োগ করা হয়েছে সেগুলো বিপন্ন করে অকাল প্রস্থান করবেন না। রাজনৈতিক পর্যায়ে তিমুরীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্মিলন প্রক্রিয়া ও সংহতকরণ শেষ হয়নি। সেই দেশের সমাজের মধ্যেই যে বিভাজন রয়েছে তা দূর করা দরকার ছিল। দ্বিতীয় হলো নিরাপত্তা খাত। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর প্রশ্নটি কাটছাঁট করে মীমাংসা করা

যায় না। এর মীমাংসা করতে হবে ব্যাপকভাবে এবং তিমুর লিসতের সঙ্কটের অংশবিশেষ খণ্ডিত প্রচেষ্টার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। তৃতীয়ত, শান্তি বিনির্মাণ প্রয়াসের কথা আবারও চলে আসে। প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও তিমুর লিসতের দারিদ্র্য ব্যাপক। কেননা সেখানে বেকার যুবকের সংখ্যা প্রচুর। উন্নয়নের এই বিষয়টির নিষ্পত্তি না হলে, আমি আগে যেসব সমস্যার কথা বলেছি, সেগুলো সমাধানের ব্যবস্থা না হলে সহসাই আগুন জ্বলে উঠবে। শান্তিরক্ষায় বিনিয়োগ করতে হলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, আমরা সব সমস্যার সমাধান করছি, আমরা অকাল প্রস্থান করছি না এবং এমন একটা পরিমাপক রয়েছে যেখানে সবাই মতৈক্যে উপনীত হয়েছে। এই অবস্থায়ই আমাদের প্রস্থানের সময় কখন হয়েছে তা নির্ধারণের একটা যুক্তিসঙ্গত ও বস্তুনিষ্ঠ ওপায় আমরা অর্জন করব।

ডিপিকেওর সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর মোতায়েন ও শান্তিরক্ষার জটিলতা বৃদ্ধির কি প্রভাব পড়ে?

আমরা 'শান্তি কার্যক্রম ২০১০' শীর্ষক একটি বড় ধরনের সংস্কার প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত রয়েছি। কারণ মিশনগুলো বেশি জটিল হয়ে পড়েছে, এগুলোর জন্য সদর দপ্তরে 'ওয়ান স্টপ শপ'-এর প্রয়োজন। মাঠ পর্যায় থেকে আমরা যে অনুরোধ পাচ্ছি এটা তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই আমরা একটা সমন্বিত টিম গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, কার্যক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয় গভীর হবে এবং আমাদের কাঠামো ও পদ্ধতি জোরদার হবে। এই ব্যবস্থা এজন্য যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে ঐ ধরনের কার্যক্রম সামলানো যাচ্ছে না।

যৌন ও অন্যান্য অপব্যবহার মোকাবিলায় আচরণ ও শৃঙ্খলা ইউনিট কতটা কার্যকর?

আমাদের অনেক মিশনে আচরণ ও শৃঙ্খলা ইউনিট গঠন প্রণালিবদ্ধকরণের প্রয়াসে সদস্য দেশগুলোর সহায়তায় আমরা আনন্দিত। আমার মনে হয় যে, প্রতিরোধ ও প্রশিক্ষণের মতো কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলো কার্যকর হবে। এর ফলে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবাপন্ন হবো না। যৌন শোষণ ও অপব্যবহার প্রশ্নের সমাধানের জন্য সেনা মোতায়েনের আগে আপনাকে প্রথমে প্রতিরোধের কথা ভাবতে হবে, যাতে সদস্য দেশগুলো এ বিষয়ে সংবেদনশীল হয়। সেনা মোতায়েন হয়ে যাওয়ার পর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তবে কোনো অঘটন ঘটে গেলে ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাকে তৎপর থাকতে হবে। ব্যাপার হলো, আমাদের চোখ-কান আছে এবং যারা এ কাজে তাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে তারাও অনেক কথা বলে। বিষয়টি আমরা ছেড়ে দেব না বলে সংকল্পবদ্ধ কেননা এটা একটা উলে-খযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এটা হলো ১ লাখ লোকের একটি নগরীতে পুলিশের ব্যবস্থা করা, নগরীর জনসংখ্যা অব্যাহতভাবে পরিবর্তন হয়। ফলে পুলিশের ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টাটিতেও রদবদল অব্যাহত থাকে। এটা বিশ্বের বিভিন্ন সেনাবাহিনীর পরিবর্তনশীল সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপার। তাই সদস্য দেশগুলোর পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের সঙ্গে আমাদের সংলাপ প্রয়োজন; তবে আমাদের আরো বেশি কিছু করতে হবে। নতুন যে সমঝোতা স্মারকে উদ্দেশ্যগুলো আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরে বিধিমালা নির্ধারণের কথা ছিল, যার মান সদস্য দেশগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। তার মান গত সাধারণ পরিষদ শেষ হওয়ার আগে সম্পন্ন না হওয়ায় আমি হতাশ। ২০০৭ হবে আমাদের অগ্রাধিকার, যাতে আমাদের প্রত্যাশা সবাই বুঝতে পারে। বার্তাটি স্পষ্ট: এই বিধিমালাকে যে-ই গ্রহণ করবে ও স্বাগত জানাবে, তাকে জবাবদিহিতায় থাকতে হবে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল জিন-ম্যারি গুহেনোর সঙ্গে UN Chronicle-এর একটি সাক্ষাৎকারের ভাষান্তর

চিত্রে জাতিসংঘের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বিশ্ব শরণার্থী দিবসে আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী

২৭ জুন ২০০৭

বিশ্ব শরণার্থী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এক আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের জননীর ওপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর প্রতিনিধি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ।

ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিনিধি বক্তব্য রাখছেন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মেম্বার অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী বিষয়ক ছবি দেখাচ্ছেন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মেম্বার বক্তব্য রাখছেন

দর্শকের একাংশ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

বিশ্ব পরিবেশ দিবস জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন, যা ৫ জুন সারা বিশ্বে ১শ'র বেশি দেশে পালিত হয়। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ঘোষিত এই দিবসটি পালনের দায়িত্ব জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) ওপর অর্পিত রয়েছে। ইউএনইপি)-এর আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর কেনিয়ার নাইরোবিতে অবস্থিত।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরিবেশের গুরুত্বের প্রতি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং রাজনৈতিক মনোযোগ ও কার্যক্রমকে উজ্জীবিত করা। এই আয়োজনের প্রয়াস হলো পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে একটা মানবিক অবয়ব দেয়া, স্থিতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের সক্রিয় বাহক হতে মানুষের ক্ষমতায়ন করা, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু যে সমাজ এই ধারণা এগিয়ে নেয়া এবং যে অংশীদারিত্ব সব দেশ ও সব মানুষের একটি অধিকতর নিরাপদ এবং অধিকতর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ ভোগ নিশ্চিত করবে তার সপক্ষতা অবলম্বন করা।

বিশ্বব্যাপী বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের প্রধান স্থান হিসেবে প্রতি বছর একেকটি নগরী বেছে নেয়া হয়। বিশ্ব পরিবেশ কর্মসূচির সহযোগিতায় স্বাগতিক সরকার এবং/বা নগরী আয়োজনের ধারা নির্ধারণ করে। বিশ্বব্যাপী বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তথ্য উপকরণ ও প্রসারমুলক কার্যক্রম তুলে ধরার মতো একটি প্রতিপাদ্য, শ্লোগান ও লোগো নির্বাচন করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ব্যাপারে প্রতি বছর আগ্রহ বেড়েই চলেছে, যার প্রমাণ দেশ, সংস্থার মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে যারা জাতিসংঘের এই গুরুত্বপূর্ণ দিবসের প্রতি সমর্থন দিচ্ছে, আর পরিলক্ষিত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক পৌরসভা, ব্যবসায়ী মহল ও সমাজের অংশগ্রহণ এবং লাখ লাখ লোকের ইউএনইপির বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ওয়েবসাইট পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আগে ও দিবস চলাকালে যেসব কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয় তা ব্যাপক। এটি নিঃসন্দেহে জনগণের আয়োজন, যাতে থাকে সড়ক র‌্যালি, বাইসাইকেল বহরের কুচকাওয়াজ, গ্রিন কনসার্ট, স্কুলে রচনা প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মতো বর্ণাঢ্য কর্মসূচি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তিক' আয়োজনও যা ভবিষ্যৎ বংশধরের কল্যাণে আমাদের গ্রহের পরিবেশগত স্বাস্থ্য রক্ষার ওপর সেমিনার, কর্মশিবির ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের সুযোগ সৃষ্টি করে। গণমাধ্যম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দিবস আয়োজনে বিশ্বের হাজার হাজার সাংবাদিককে পরিবেশের ওপর রিপোর্ট তৈরিতে অনুপ্রাণিত করে।

দিবসটি রাজনৈতিক মনোযোগ ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্মকর্তা, রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান, এবং পরিবেশ মন্ত্রীরা বিবৃতি দেন এবং ধরিত্রীর প্রতি যত্নশীল হবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট ফিদেল রামোস ফিলিপাইনদের প্রতি ৫ জুন ঠিক দুপুরে বিরতি পালন করে একযোগে পরিচ্ছন্নতা ও সবুজের কথা ভাবা এবং প্রকৃতির কাছ থেকে যে কর্মশক্তি আহরণ করা হয়, অনুকূল ও আনন্দভরা উদ্দীপনা নিয়ে তার মধ্যে তা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান। অনেক ভাবগম্ভীর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়, যা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত স্থায়ী সরকারি কাঠামো প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো স্বাক্ষর বা অনুমোদন করার সুযোগও সৃষ্টি করে।

বছর	স্বাগতিক নগরী	দেশ
২০০৭	ট্রমসো	নরওয়ে
২০০৬	আলজিয়ার্স	আলজিরিয়া
২০০৫	সান ফ্রান্সিসকো	যুক্তরাষ্ট্র
২০০৪	বার্সেলোনা	স্পেন
২০০৩	বৈরুত	লেবানন
২০০২	শেনঝেন	চীন
২০০১	টরিনো/হাভানা	ইতালি/কিউবা
২০০০	এডেলেইড	অস্ট্রেলিয়া
১৯৯৯	টোকিও	জাপান
১৯৯৮	মস্কো	রুশ ফেডারেশন
১৯৯৭	সিউল	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
১৯৯৬	ইস্তাম্বুল	তুরস্ক
১৯৯৫	প্রিটোরিয়া	দক্ষিণ আফ্রিকা
১৯৯৪	লন্ডন	যুক্তরাজ্য
১৯৯৩	বেইজিং	চীন
১৯৯২	রিওডি জেনিরো	ব্রাজিল
১৯৯১	স্টকহোম	সুইডেন
১৯৯০	মেক্সিকো সিটি	মেক্সিকো
১৯৮৯	ব্রাসেলস	বেলজিয়াম
১৯৮৮	ব্যাংকক	থাইল্যান্ড
১৯৮৭	নাইরোবি	কেনিয়া

বিশ্ব পরিবেশ দিবস মেলা

৫-৭ জুন ২০০৭

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ সংস্থাগুলো তিনদিনব্যাপী এক প্রদর্শনী মেলায় অংশগ্রহণ করে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় মেলাটির আয়োজন করে। জাতিসংঘ স্টলটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিল ইউনিক ঢাকা।

জাতিসংঘ স্টলে দর্শকদের জাতিসংঘ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে দেখা যাচ্ছে

দর্শকবৃন্দ জাতিসংঘ স্টলটি ঘুরে দেখছেন ও প্রকাশনা সংগ্রহ করছেন

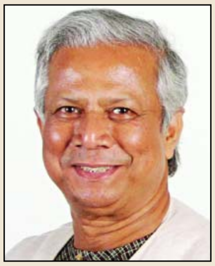

মহাসচিবের এজেন্ডা : বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি অগ্রাধিকারদান –মুহাম্মদ ইউনুস

একবিংশ শতাব্দীতে জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত বান কি-মুন উত্তরাধিকার সুত্রে এমন সব দায়িত্ব পেয়েছেন যেগুলো বিশ্বজোড়া, আর এসব দায়িত্বের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে শান্তি , সমৃদ্ধি এবং এ দুয়ের ভেতর যা থাকতে পারে তার সবকিছু।

বিশ্বের পারস্পরিক সংশি-ষ্টতা ও দ্রুত অগ্রসরমান প্রযুক্তি পুরনো অধ্যায়ের সমাপ্তি না টেনেই পুরোপুরি একগুচ্ছ নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই ক্রমবর্ধমান জটিল সময়ে পলকের মধ্যে যেসব সংকটসঙ্কুল ও মারাত্মক সংঘাতের আগুন জ্বলে উঠবে তা সামাল দিতে মহাসচিবকে হিমশিম খেতে হবে। তবে মানবজাতির সবচেয়ে বড় নৈতিক বিষয়-বিশ্বের দারিদ্র্যমুক্তির এজেন্ডাকেও তার অগ্রাধিকার দেয়া অপরিহার্য।

দারিদ্র্য একটা মারাত্মক সমস্যা যা বিশ্বের নিরাপত্তার বিষয়গুলোর ওপর আঘাত হানছে এবং বিশ্বের প্রায় অর্ধেক লোক দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। দারিদ্র্য শান্তির প্রতি একটা বড় হুমকি। গ্রামীণ ব্যাংককে ২০০৬ সালের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার দিয়ে নরওয়েজীয় নোবেল কমিটি এই বিষয়টিকেই সমর্থন দিয়েছে যে, দারিদ্র্যের সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিশ্বের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ লোক বিশ্বের শতকরা ৯৪ ভাগ আয়ে জীবনযাপন করে। বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দিনে ২ ডলারের কমে জীবনধারণ করে এবং এর অর্ধেক আয়ে একশ’ কোটির বেশি লোক দিন কাটাচ্ছে। শান্তির এটা কোনো সূত্র নয়-চরম দারিদ্র্যে সৃষ্ট হতাশা, বৈরিতা ও ক্রোধ কোনো সমাজেই শান্তি টিকিয়ে রাখতে পারে না।

দারিদ্র্য নতুন নয়, কিন্তু দারিদ্র্য মোচনের সৃজনশীল নতুন নতুন কৌশল রয়েছে। বিশ্বব্যাপী এক বিরাট স্বপ্ন নিয়ে নতুন সহস্রাব্দ শুরু হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০০০ এবং পরে ২০০৫ সালে বিশ্বের দারিদ্র্যবিরোধী এজেন্ডা হিসেবে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) ঘোষিত হয়। আটটি এমডিজি এই বাস্তবতাকে সুদৃঢ় করে যে, বহুবিধ দিক থেকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই এমডিজিগুলোতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং রোগব্যাধি নির্মূলের লড়াই চালানোর মাপকাঠি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার গুরুত্বের কথা দেশগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়া নতুন মহাসচিবের দায়িত্বকালীন একটা প্রধান উদ্দেশ্য হতে হবে।

জাতিসংঘের সভা-সম্মেলন আহ্বানের ক্ষমতাও দারিদ্র্য মোচনের প্রয়াসকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান যেমন বলেছিলেন, ‘আমরা গতানুগতিকতাকে ভাঙতে পারলেই’ এমডিজিগুলো অর্জিত হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য বিশ্বের প-াটফর্মের প্রধান হিসেবে মি. বান স্থায়ী পরিবর্তনের ক্ষমতা সংবলিত বিচ্ছিন্ন খাতগুলোকে একত্র করতে পারার এক অনবদ্য অবস্থানে রয়েছেন। এসব খাত হলো : সরকার, ব্যবসা, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ফাউন্ডেশন, ব্যক্তিবর্গ ও স্বয়ং জাতিসংঘ। উপযুক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অগ্রগতি লালনে সব খাত এবং দরিদ্রসহ সব ব্যক্তির ক্ষমতায়ন করা যাবে।

যে খাত এ ধরনের অগ্রগতি ও সহযোগিতা যাচ্ঞা করছে তা হলো জ্বালানি খাত। এই গ্রহের কোনো আনাচ-কানাচ কিংবা এর কোনো অধিবাসীই সুলভ ও সহজপ্রাপ্য জ্বালানির উৎসের প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয় এবং বিকাশমান অর্থনীতির জন্য এটা একটা অপরিহার্য প্রয়োজন। জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেলের সাম্প্রতিক রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, জীবাশ্মজাত জ্বালানির ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা

ধরিত্রীকে এমনভাবে নিকট থেকে নিকটতর অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে, যেখান থেকে ফেরার কোনো পথ নেই, যার পর অনিবার্য হলো অপূরণীয় ক্ষতি। পরিতাপের কথা হলো উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলের দ্বীপ ও উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর দরিদ্ররা এই অভিঘাত অনুভব করবে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে। তাই গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের যে পথ তা দারিদ্র্য মোচনও করতে পারে এবং সেই পথ তাই হতে হবে।

নতুন জ্বালানি অর্থনীতিতে স্থানান্তরের চ্যালেঞ্জ অনেক, তেমনি সুযোগও বেশি; আর যে সমাধান তাও আমাদের আওতার মধ্যে। নতুন জ্বালানি প্রযুক্তিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উত্তরণ এবং সৌর, বায়ু ও জৈব জ্বালানির মতো কম নির্গমনের নতুন ও বিকেন্দ্রিক ধরনের জ্বালানির সুযোগ রয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য রয়েছে অর্থনীতিকে রূপান্তর ও অন্যের ওপর অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীল অঞ্চলের ওপর নিরাপদ জ্বালানির উৎসের জন্য নির্ভরতাকে সীমিত করবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ এখন উপযুক্ত।

মহাসচিব মি. বান ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর দায়িত্বকালে জলবায়ুর পরিবর্তন হবে একটা উচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, এটা দারুণভাবে দরিদ্রদের ওপর প্রভাব ফেলবে এবং এ জন্য প্রয়োজন হবে দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবি-উ বুশ এবং মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে বৈঠককালে বিষয়টি নিয়ে তিনি কথাও বলেছেন। তাঁর সতর্ক দৃষ্টি যেন নিস্প্রভ হয়ে না যায়। এছাড়া গণমাধ্যমের কিছু রিপোর্ট অনুসারে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের নির্বাহী সচিব ইয়োভো ডি বোয়ের বলেছেন, জাতিসংঘের একটা আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করা দরকার যেখানে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন। এই পরামর্শ মি. বান জোরালোভাবে বিবেচনা করছেন বলে জানানো হয়েছে। গ্রহণ করার মতো এই পথটিই যথার্থ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কিয়োটো প্রটোকলের একটা ফলানুবর্তী চুক্তি প্রণয়নে আগামী বছরগুলোতে গঠনমূলক আলাপ-আলোচনা করতে হবে। এটা গ্রিন হাউস গ্যাস কেন্দ্রীভূতকরণ স্থিতিশীল করবে। এর ফলে বিপজ্জনক নির্গমন হ্রাস, অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি এবং বিশ্বের দারিদ্র্য মোচন ও ইকোব্যবস্থার অবনতি রোধে সহায়তার পথ সুগম হবে।

করপোরেশন, এনজিও ও ফাউন্ডেশনগুলোকে এই লড়াইতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করতে হবে। কেননা নতুন নতুন ধরনের সমাধান বের করা এবং বিশ্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর আওতা প্রসারে তার ক্ষমতা অতুলনীয়। গ্রামীণ পরিবারের সদস্য গ্রামীণ শক্তি একটা অলাভমুখী সংগঠন যা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত পল-ী এলাকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও বিকাশের জন্য এক দশক আগে গড়ে তোলা হয়। ৪২ হাজারের বেশি গ্রামীণ পরিবারকে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সরবরাহে গ্রামীণ শক্তি বাজারভিত্তিক উদ্যোগ এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ নীতি ব্যবহার করে। ২০০০ সাল থেকে গ্রামীণ শক্তির আওতার দ্রুত বিস্তৃতি ঘটে, যা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিপুল শক্তির একটা দৃষ্টান্ত।

একটা নতুন জ্বালানি অর্থনীতিতে পরিবর্তন করে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য মোচনে এর সম্ভাবনা অপরিমেয়। তবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যে এই একটি মাত্র চ্যালেঞ্জই মোকাবিলা করতে হবে তা নয়, কিংবা দারিদ্র্য মোচনে জাতিসংঘের ভূমিকা যে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেই সীমিত থাকবে, তাও নয়। বিভিন্ন সমাজে আলাদা আলাদাভাবে জাতিসংঘের বিপুল প্রয়াস গুরুত্বপূর্ণ এবং মহাসচিব বানকে এসব প্রয়াসকে জোরদার করে যেতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, দারিদ্র্যবিরোধী লড়াইরত ভিন্ন ভিন্ন কর্মীকে একত্র করতে গিয়ে ব্যক্তিকর্মীকে তাঁর ভুলে গেলে চলবে না।

বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় দু'-তৃতীয়াংশেরই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবা বা নিজেদের সম্পদ গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় পুঁজির সুযোগ নেই। গ্রামীণের মতো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নতুন ধরনের উদ্যোগ ঋণ, ভূমির মালিকানা অর্জন ও মানব অগ্রগতির অন্যান্য অপরিহার্য কাঠামোর সুযোগ প্রসারে অবদান রেখেছে। গ্রামীণে আমরা দেখিয়েছি যে, ব্যক্তির ক্ষমতায়ন ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি দারিদ্র্য মোচনে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। ৪২ জনকে আমার নিজের পকেট থেকে ২৭ ডলার ঋণ দিয়ে যা শুরু করা হয়েছিল তা এখন একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা প্রায় ৭০ লাখ লোককে ছয়শ' কোটি ডলারের বেশি ঋণ দিয়েছে, ঋণ গ্রহীতাদের শতকরা ৫৮ ভাগের বেশি দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করেছে। মহাসচিব বান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিপুল দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে একটা সংস্থা প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও শত শত কোটি দরিদ্রের সুষ্ঠু সেবা তখনই হবে যদি তিনি ব্যক্তিকে ক্ষমতায়নের কথা ভুলে না যান।

আমি বিশ্বাস করি যে, সবাই মিলে আমরা একটা দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি। দারিদ্র্য দারিদ্র্যের দ্বারা সৃষ্টি হয়

জীবনী

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এই ব্যাংক ২,২৮৩টি শাখা পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ৬৮ লাখ ৩০ হাজার দরিদ্রজনকে ঋণ দিচ্ছে। অধ্যাপক ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংককে সমাজের নিচ থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সৃষ্টির প্রচেষ্টার জন্য ২০০৬ সালের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। তিনি আরো অনেক আন্তর্জাতিক পদক ও সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন এবং জাতিসংঘের অনেক উপদেষ্টা গ্রুপ, কমিশন ও কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org